পাঠপ্রচয়

চতুর্থ ভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
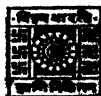
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা.

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৩৬
পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৩৩৮
... ...
পুনর্মুদ্রণ : মাঘ, ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৩৫২

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
—৫৫+৭—৫. ১. ৪৬

সূচীপত্র

বিদ্যাসাগরজননী

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফপটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা ও উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতাসাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা,

ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোকপ্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহ-গ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননী-দেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, "যে সকল দরিদ্রলোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে।"

(দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ।) কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ৬।৭ শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো।" ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর

করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে,— তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিকপ্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে? অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্য জ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্ব-ধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন, তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন— "জননীদেবী সাহেবের ভোজন-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতিবৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজন-সময়ে চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব হিন্দুর মতো জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। জননীদেবী

প্রবীণ হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয়, কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী, কি অন্যধর্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।”

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন, “১২৬৬ শাল হইতে ৭২ শাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপে যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, এ কারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।”

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন; আর, (এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল।) অভিমন্যু জননীজঠরে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভ-বাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্তসমুদ্রে গিয়াছে, কোনো

পথ অনন্তশিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছি। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প প্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে—এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে-যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

বহুকাল নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

গঙ্গার শোভা

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা, এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা, ছায়া, কুটির—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, আর বাকি কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নিচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর-এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতিঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসি কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ-ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম

ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেওলা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। (মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন।) অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাতনি, কেহ ইহার মা মাসি। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। (গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে।) তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া

উঠিয়াছে। এক-এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো-কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া-দেওয়া—দুই-চারিটি গোরু চরিতেছে, গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের খেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নিচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর-এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে;—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা এবড়োখেবড়ো—ইতস্তত কতকগুলা ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই

অনুর্বরতা-বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সম্মুখে ঘাট, নহবতখানা হইতে নহবত বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আরো দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটিরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিতেছে, আর-এক দিকে তুলসীতলা। সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মতো সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে-সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো, ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো পশ্চিম দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের

উপরে অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্‌ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভালো দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ উঠে, আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর-অন্ধকার অশথগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ওপারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আরো খানিকটা আলো পড়ে—সেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ওপারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। (এপারে নিদ্রার রাজ্য আর ওপারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।)

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খরপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনো তরঙ্গসংকুল, কখনো শান্ত, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কূলকিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুরবন, আমবাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক-একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালনপূর্বক একটি বড়ো স্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানবসন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশি পোশাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটিরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, তাহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর-একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে, তাহার বৃত্তান্ত আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জিউর মন্দিরের অধিকারিণী।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী-বর্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকিবকেয়া আদায়, সীমা-সরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকী কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ,

পল্লীবাসী ভদ্র পুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধানপদে, সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না।

পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনোপ্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি কঠিনভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি-দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলোআনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তকতক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ

অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুর-বাড়িতে পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকোচুরি খেলা উপলক্ষ্যে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্যদিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিত না; জয়কালীর একটি বাবুর্চিকরপক্ব-কুক্কুটমাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষ্যে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়া-ছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী, ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে, যে-বালকটি মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেইখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেইখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই

প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে যে কেহ খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি।"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটীরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ

ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন।"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনো ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন।"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘনপল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে-লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকসিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ

গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দী-তীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে, বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন, এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চাৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা ফিরে যা। আমার মন্দির অপবিত্র করিসনে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ-জিউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বোম্বাই শহর

বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই শহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তাগুলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল, যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটসাঁট পোশাক পরাইয়াছে এবং তাহার কোমরবন্ধ এমনি করিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরিয়াছে; গাধাবোট

বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল, তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয়, কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত;—যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে, তেমনি আর-এক দিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে—ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যখন দেখিলাম, শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার শহরে এক ইডেনগার্ডেন আছে—কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সে রাজপুরুষের তৈরি বাগান, সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু সমুদ্র তো কাহারও তৈরি নহে। ইহাকে তো বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সব চেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায়, তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি, তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই দেখার একটা দণ্ড আছে। নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্ণে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে; কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে, সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপর একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি, কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পারসী রমণী নহে, কপালে সিঁদুরের কোঁটা-পরা মারাঠী

মেয়েরাও বসিয়া আছেন—মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারিদিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে কত সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বিডনপার্ক ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম—তাহার সে কী লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে, তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি, তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজ-কর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে

পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে, আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই, তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে, কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না—পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য। এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা, প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে, তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশীলোকের ধনশালিতা। কত পারসী মুসলমান ও গুজরাটী বণিকদের নাম এখানকার

বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে, এইজন্য তাহা বড়ো ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মতো—তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে, তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারী, পারসী, গুজরাটী, পাঞ্জাবীদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশে চাঁদার খাতা আমাদের গোরুর মতো—তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতন ভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দ বোধ হয়।

স্বাধীন শিক্ষা

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল, যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি-কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি-বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? পাঠশালার বাহিরে সমস্ত দেশের মধ্যে আমাদের শিক্ষালাভের কি কোনো স্বাধীন ক্ষেত্র নাই?

য়ুরোপের ন্যায় যে-দেশে নানা আলোচনা, নানা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড়শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়-গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে

পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই আমাদের বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। কেননা, আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার

অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে-ইতিহাস আমাদের দেশের জন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর-কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট, দুর্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তব অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি

নাই ; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি ; ধর্ম, সমাজ, এমন-কি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির প্রতি যদি ছাত্রেরা লক্ষ্য রাখে তবে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।

ছাত্রেরা কেবল পরের কাছ হইতে শিক্ষা করিবে কিন্তু শিক্ষার বিষয়কে নিজে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, এরূপ ভীরুতা যেন তাহাদের মনে না থাকে। দেশের সাহিত্য-রচনায় সহায়তা করিবার ভার তাহারাও গ্রহণ করিতে পারে। বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে সেই ছাত্রেরা কিরূপ সাহায্য করিতে পারে ও তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ এখনো রচিত হয় নাই। কাজটি সহজ নহে। কেননা এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত-লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা একথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে। তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা

বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতে পারে না। ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, পোদ, বাগদি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক

বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।

'আইডিয়া' যত বড়োই হোক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হোক, দীন হোক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণসুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান-করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা-রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে-ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণ-চীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে পড়া মুখস্থ করাইয়া চাকরির উমেদারিতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

ছাত্রগণ, আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই; তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু

নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নিচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয়ই জানিতেছি মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরে সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র-বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি, দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও তবে তোমরা যথার্থই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে; তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলের অবসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জগতের জ্ঞানীসভায় স্বদেশকে সমাদৃত করিতে পারিবে।

ভ্রাতৃপ্রীতি

ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন অধিকারের জন্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন; গোবিন্দমাণিক্য সে সংবাদ জানিতে পারেন। ইহার পরের ঘটনা—দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ ও আলাপ—বর্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত হইল।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভান করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে।"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই, একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দমাণিক্য

অতিশয় বিষণ্ণমুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যে হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষকে মানুষ ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না? এ সংসারে হিংসা লোভই এত বড়ো হইয়া উঠিল, আর স্নেহ প্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না!—এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন একগৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের কোণে ছুরি শানাইতেছে।—(গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল।) ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির মধ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের মনে কেবলি হিংসা লোভ দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি—আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীষণ কুকুরের মতো চারিদিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খর নখরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত

হওয়াই ভালো। প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেম-মুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্ণে গোমতীতীরে নির্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারি মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়া ছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে-ভাবনাগুলি কীটের মতো কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল সেগুলি যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখামাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই-একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন

নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যে সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল, ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে একটা ফাঁক। একটা স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও।"

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার

আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল— সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নিচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই—কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল—সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী-রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে, ভাই! রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে করো রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজচ্ছত্র? এই মুকুট, রাজচ্ছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জানো? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র

লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে-ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখ-হরণ যে করে সে-ই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোনোও রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্নকন্থা আছে। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।”

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল, নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই—এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা, একই পিতামহের রক্ত—তুমি সে রক্ত পাত করিতে চাও

করো, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না। এইজন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই—এ-কথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই।" রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তা জানি। তুমি কি কখনো আমাকে আঘাত করিতে পারো। তোমাকে পাঁচজনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "কোথায় যাইব, বলিয়া দিন। আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমি এখান হইতে, রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন, "তুমি আমারই কাছে থাকো—আর কোথাও যাইতে হইবে না।—রঘুপতি তোমার কী করিবে।"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

জীবনস্মৃতি

রাজনারায়ণ বসু

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ-বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতো ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখ কষ্ট, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন', কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি

মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদিগের সঙ্গে মিলিয়া তিনি ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

> একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এমন আর কাহারো নহে।

মানিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ ছিল সেখানে আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম—দেখিতাম, তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন তিনি কানে কম শুনিতেন। এইজন্য পারৎপক্ষে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর-কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিতাম। এমন অল্প বিষয় ছিল, যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল, তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণ্যের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন—অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। যোদ্ধৃবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপদ্‌জনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায়, সেনেট সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত।

তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান্। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না। এশিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব-আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে এই উপলক্ষ্যে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্রমহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র, ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে আমিই বুঝি কৃতী আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোনো একদিন সে মনে করিয়া বসিত—লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র

এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যখন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি

বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সেই সম্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে, সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতে ছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশীল মননশীল লেখকের ভাব ছিল তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল, তাহার ছবিটি আমার

মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু ঘরে ঢুকিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের কবিতার একস্থলে, অশ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পণ্ডিতমহাশয় যেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বঙ্কিমবাবু হাত দিয়া মুখ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

খোকাবাবু

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালনকার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে, মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন ; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের এক পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে

উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমনসকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র শিশুটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিতে খিল্‌খিল্‌ হাস্য-কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্বে সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্‌ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিচি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন!' বাস্তবিক শিশুর মাথায়

এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত —আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন।

অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।৮

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং ঝাউবন জলে ডুবিয়া গেল। পাড়ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চাপিয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে

ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন, ফু!"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে শিশুর এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো, ও—ই দেখো পাখি— ওই উড়ে-এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়"— এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলবর করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা— বিশেষত চারিদিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট্ করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল— দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা

বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু— খোকাবাবু, লক্ষ্মি, দাদাবাবু আমার।"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন-হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্‌ করিয়া মাঠাক্‌রুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানিনে মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না; এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস্‌ তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্য ক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা

ধড়াস্‌ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথাসময়ে পিসিকে পিচি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল— তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতেই পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিচি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।" তখন এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সে জন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি

এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না— রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের সময় হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরির জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ— কেশবেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য ছিল এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে-যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে-ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে

যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়— কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৮/

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, "আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।" এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে পালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে

সন্তান-কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, "জয় হোক—মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে।"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাক্রুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, মাঠাক্রুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, "প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি— "

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কী রে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার। কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্ত নয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া

ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা-আকার-প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল, "এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমন হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, "কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয়, প্রভু!"

"তবে কে।"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

মেলা

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়,— তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে— কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয়, তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে— সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে। প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে

জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এইসকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন,— কোনো-প্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয়, পথ-ঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন— তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা-দ্বারা সমস্ত ব্যাপার-টাকে লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে— ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং

ইহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণ-বশত অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ আহ্লাদ সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না— সে স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে কিন্তু 'মিষ্টান্নম্‌' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে • এবং যে-সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলাসম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত— বাংলার পল্লীদ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে,

এই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে। আমরা এই দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নিচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথি-শালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, জলদান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য ছিন্ন-সমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে [illegible]য়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম [illegible] হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে [illegible]বতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য [illegible]পনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত [illegible]প পালিত হইলে ব্যক্তিগত ভাবে [illegible]ণ ভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া [illegible]

[illegible]ত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা [illegible] দেওয়া অসম্ভব। প্রতিদিন প্রত্যেকে [illegible]পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প— একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশ-বলি-স্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন

ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে— আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে— কদাচ নহে। স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব— তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে— যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে— যখন প্রত্যেকে জানিব, আমি একক নহি, আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

বিদ্যাসাগরের দয়া

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালীহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালীজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালীদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট-লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শেল্‌সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, "তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না অগ্রে জানা আবশ্যক।" শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেইদিনেই ত্রিশক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার

মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষ-মহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক-সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস-নিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিনজনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতে-ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ারগ্রামে অ্যাসেসর্‌বাবুর নিকটে আসিয়া আপত্তিপ্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নর

বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন্‌সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন— এইরূপে দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়-নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্যচেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেকস্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাঁহার অনুপস্থিত

আত্মীয়পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য— বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত; এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে ঋজু-রেখায় নিঃশঙ্কে নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি, চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে, "খর্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয় স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন।" শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন, "অন্নছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত তাহারা পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই

আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।”

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে— কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে-পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক-প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজে ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্বক তাহাকে আশুবৈধব্যের

তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগরগ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করি, "বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয়ের নব-বিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস্ না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহির-বাটীতে আসিলেন এবং নানা-প্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।'"

য়ুরোপের ছবি

২৯ আগস্ট। জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে আসিয়া জাহাজ থামিল। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বত-বেষ্টিত তটশোভা আমাদের আলস্যবিজড়িত অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্নমরীচিকার মতো লাগিতেছে। আজ রাত্রেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

৩০ আগস্ট। দূর সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলি রৌদ্রতাপে ক্লান্ত এবং বাষ্পাকুল দেখাইতেছে— যেন একটা মধ্যাহ্নতন্দ্রার আবেশে জলস্থল অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

বহুদূরে এক-আধটা জাহাজ দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক-একটা পাহাড় জাগিয়া উঠিতেছে— অনুর্বর, কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ, দগ্ধ, তপ্ত, জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মতো সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা উদাসীনভাবে তাকাইয়া আছে— সম্মুখ দিয়া কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত নাই।

সূর্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার বর্ণবিকাশ হইয়াছে। সমুদ্রের তলদেশে একটি রেখামাত্র নাই। দিগন্তবিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন নীলাম্বুরাশি পরিণত যৌবনের মতো আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। এই সুবিপুল অখণ্ডতা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া আছে। বৃহৎ

সমুদ্র যেন অকস্মাৎ এমন একটি স্থানে আসিয়া থামিয়াছে যাহার ঊর্ধ্বে আর গতি নাই, পরিবর্তন নাই, যাহা অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণাম। মধ্যাহ্ন-আকাশে চিল নীলিমার সর্বোচ্চ সীমায় উঠিয়া দুই পাখা সমতলরেখায় প্রসারিত করিয়া যেমন হঠাৎ গতি বন্ধ করিয়া দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র যেন সহসা সেইরূপ একটি অপার প্রশান্তির চরম সীমায় আসিয়া পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১ সেপ্টেম্বর। পূর্বদিকে নবকৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর একটি সীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণপাতে যেন কোন্ রহস্যপুরীর আলোকপথ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা এক অলৌকিক বৃন্তের উপর স্বর্গের রজনীগন্ধার মতো বিকশিত,—লোক-লোকান্তরের নক্ষত্র তাহার প্রতি স্থিরভাবে চাহিয়া আছে এবং দূর-দূরান্তরের তরঙ্গ তাহাকে বেষ্টন করিয়া অনন্তকালের পুরাতন সামগাথা গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করিতেছে।

৩ সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে জাহাজ আসিয়া থামিল। চারিদিকে অপরূপ বর্ণসমাবেশ। পাহাড়ের উপর কোথাও সূর্যালোক, কোথাও ছায়া, কোথাও নীল বাষ্পের আবরণ। ঘন নীল সাগরপ্রান্তে বালুতটে রৌদ্র-দুঃসহ গাঢ় পীতরেখা।

৬ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে; বায়ু শীতলতর, সমুদ্র গাঢ়তর নীল। চিঠি লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া বামে

চাহিয়া দেখিলাম, আয়োনিয়ান দ্বীপমালা দেখা দিয়াছে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে, সমুদ্রের একেবারে তটপ্রান্তে মনুষ্য-রচিত যেন একটি শ্বেত মৌচাক দেখিতেছি। ইহাই জান্তি (Zanthe) নগরী। দূর হইতে মনে হইতেছে, পাহাড়টা যেন তাহার প্রকাণ্ড করপুটে একমুঠা শ্বেত পুষ্প লইয়া সমুদ্রকে অঞ্জলি দিতেছে।

৭ সেপ্টেম্বর। ব্রিন্দিসি পৌঁছিয়া আজ গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি যখন ছাড়িল তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রথমে দুইধারে কেবল আঙুরের খেত— তাহার পর জলপাইয়ের বাগান দেখা দিল। জলপাই গাছগুলা নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বৃদ্ধের চর্মের মতো বলিচিহ্নিত, খর্বাকৃতি। প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি অনায়াসনৈপুণ্য দেখা যায়, এই গাছগুলায় তাহার বিপরীত। ইহারা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, বহুকষ্টে বহুচেষ্টায় কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বামে চাষ-করা মাঠ সাদা সাদা পাথরের টুকরায় বিকীর্ণ। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রতীরে এক-একটি ছোটো ছোটো লোকালয়। চর্চ্-চূড়া-মুকুটিত অম্লানশুভ্র নগরী একটি পরিচ্ছন্ন তন্বী নাগরিকার মতো কোলের কাছে সমুদ্রদর্পণ রাখিয়া নিজের মুখ দেখিয়া হাসিতেছে। নগর পার হইয়া আবার মাঠ। ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের বাগান, জলপাইয়ের বন; খেতগুলি প্রস্তরখণ্ডের বেড়া দিয়া ঘেরা; মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ, দূরে দূরে এক-একটি সাদা বাড়ি।

৮ সেপ্টেম্বর। দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্বত-শ্রেণী দেখা দিয়াছে; বামে স্নিগ্ধচ্ছায়া ঘন অরণ্যমালা। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাইতেছে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র-তরুশ্রেণী- ও শৈলশিখর-খচিত এক-একটি নব নব আশ্চর্য দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। পর্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গপ্রাসাদ, তলদেশে এক-একটি ছোটো ছোটো গ্রাম। যত অগ্রসর হইতেছি অরণ্য পর্বত ততই ঘনতর হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে যে গ্রাম দেখা দিতেছে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নহে— একটু যেন ম্লান, দরিদ্র; একটি-আধটি চর্চের চূড়া আছে মাত্র কিন্তু কলকারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্ধ্বমুখী ইষ্টকশুণ্ড নাই।

অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে গাড়ি উঠিতেছে। পার্বত্য পথ অজগর সাপের মতো বক্রগতিতে চলিয়াছে। ঢালু পাহাড়ের গাত্রে চষা খেত সোপানশ্রেণীর মতো স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি লইয়া উপলসংকুল সংকীর্ণ পথ দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

এইবার ফ্রান্সে প্রবেশ করা গেল। দক্ষিণে এক জলস্রোত অজস্র ফেনপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। সে যেন ফরাসি জাতির মতোই দ্রুত, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত, হাস্যপ্রিয়, কলভাষী। এই লীলাময়ী নির্ঝরিণী বাঁকিয়া-চুরিয়া ফেনাইয়া-ফুলিয়া নাচিয়া কলরব করিয়া পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়া ঠেলিয়া রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড়িবার চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা

লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়া তাহার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করিতেছে। জলধারা যেখানে সংকীর্ণ সেখানে দুই তীরের বৃক্ষশ্রেণী শাখায় শাখায় মিলাইয়া এই চঞ্চলাকে অন্তঃপুরে বন্দী করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা পাইতেছে। আমাদের এই পথসহচরীর সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের বিচ্ছেদ হইল। হঠাৎ সে দক্ষিণ হইতে বামে এক অজ্ঞাত শৈলান্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। মনে হয় কেবলই বাগানের পর বাগান আসিতেছে। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহু দিন হইতে বহু যত্নে দুরন্ত প্রকৃতিকে বশ করিয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করিয়াছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপরে বংশানুক্রমে মানুষের কত কালের প্রয়াস প্রকাশ পাইতেছে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে প্রাণপণে ভালোবাসিবে, তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। ইহারা যে আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপন করিয়া লইয়াছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে— ইহারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই মানুষের সেবা পাইতেছে এবং মানুষের সেবা করিতেছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থান।

বিলাসের ফাঁস

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্বকালে অল্প ছিল, সে কথা মানিতে পারি না। তখনও লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতোই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই— তখন খ্যাতির পথ এক দিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্য দিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম, পূজাপার্বণ ও পূর্তকার্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতিলাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গেছে।

কিন্তু, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসাতৃপ্তির দিকে নহে, তাহা সাধারণত নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারি সৃষ্টি করে না। মনে করো, যে-ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশি হউক-না, অতিথিরা যে-আহার পাইতেন তাহাতে বিলাসিতার চর্চা হইত না। বিবাহাদি কর্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চাল-চলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদের চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনও বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি, এ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল, এখন সাধারণের চাল-চলন বাড়িয়া গেছে অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সংকুচিত হয় নাই, এইজন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম করে; তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম নির্বাহ করো-না কেন।" সে বলিল, তাহার কোনো উপায়

নাই— গ্রামের লোক ও আত্মীয়-কুটুম্বমণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবি সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গেছে। পূর্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা শহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন নহেন তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষী গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরি দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস কেন।" সে কহিল, "বাবু, একদিন ছিল যখন জমিজমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমিজমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, বল্ তো।" সে উত্তর করিল, "আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে। পূর্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়া গুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতি র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারি করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি। ছেলেরা বিলাতি জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।"

কেহ কেহ বলিবেন, এ সমস্ত ভালো লক্ষণ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহুবন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। প্রাচ্য সমাজতন্ত্রে কতকগুলি লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে। এই উভয় পন্থাতেই ভালো মন্দ দুইই আছে। য়ুরোপীয় পন্থাই যদি একমাত্র শ্রেয় বলিয়া সপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। য়ুরোপের মনীষীগণের কথায় অবধান করিলে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের প্রাচ্যসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসর যে অটল আশ্রয়ে আমরা বহু ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছি তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর-কিছু গড়িয়া উঠিবে কিনা, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে নিশ্চিন্ত মনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে, আমি ধনী।

মুসলমান-সমাজে বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা হিন্দু-সমাজকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবি বলিত। অল্প লোকেরই সেই নবাবি চাল ছিল। এখনকার দিনে বিলাসিতাকে বাবুগিরি বলে। দেশে বাবুর অভাব নাই।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কত দিক হইতে কত দুঃখ পাইতেছি তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো। এক দিকে আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্য দিকে পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভারবহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কা বোধ করে। এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কী আছে। পণের পরিমাণও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শ-অনুসারে যে বাড়িয়া যাইবে ইহাতেও সন্দেহ নাই। এই পণ-লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে

আজকাল অনেক আলোচনা চলিতেছে; বস্তুত ইহাতে বাঙালী গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই— কন্যার বিবাহ লইয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া নাই এমন কন্যার পিতা আজ বাংলাদেশে অল্পই আছে। অথচ, এজন্য আমাদের বর্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। এক দিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য, অপর দিকে কন্যামাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা— এমন দুঃসহ নীচতা যে-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে-সমাজের কল্যাণ নাই, সে-সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কী। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব করুন, তবেই লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি; সেই

গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে-অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে, দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে— শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে— কিন্তু পল্লী-গুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নানপানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যে-দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে-দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া কোঠাবাড়ি গাড়িঘোড়া সাজসরঞ্জাম আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে; কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে-ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব

মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগ-স্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে বাহির হইতে মনে হয়, যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্যই এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

সম্পত্তিসমর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহাক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, "আমি এখন চলিলাম।"

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে-ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো-না।"

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশন-বসনের প্রথা, তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত— বেশভূষা-আহারবিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়াপরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল, ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বেশি আধি-ভৌতিকের দিকে যাইতেছে; শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্থিব

সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করে। যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তারপরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাবাকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাবা বলিলেন, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে। যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কী বেশি ধুম করিয়া মরিবে।"

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে; কিন্তু সে সময়ে তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, "আমি চলিলাম।"

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো একপয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধনগ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয়

দূর হইল। বৃন্দাবন কখন্ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে, এই আশঙ্কা তাহার সর্বদাই ছিল। যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদাই লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি-বৎসর-বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়— এবং যে-টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশকিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পলায় এমন উপযুক্ত লোক আর কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল, যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে; বিশেষত বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির

কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাতুরে উক্ত শিল্পী-অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল ; সেটি পলিতা প্রস্তুত-করণ কিংবা অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্যগৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে, যজ্ঞনাথ হুঁকাহস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগ-পূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য

সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাশ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে "চামচিকে" বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন— দেখিলেন, একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্‌ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল— আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছুদূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এই প্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন।

কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামতো আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কা।"

সে বলিল, "নিতাই পাল।"

"বাড়ি কোথায়।"

"বলিব না।"

"বাপের নাম কী।"

"বলিব না।"

"কেন বলিবে না।"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন।"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।"

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?"

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনি নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এমনি অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মতো আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্বাহ্লেই তাহার পুরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে; এবং ইহা লইয়া

মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমতো ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার সেই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, "ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, "আহা, বাপ-মার মনে না জানি কত কষ্ট হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়।"

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশ্যে অকথ্য উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারংবার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারি কৌতূহল হইল, কহিল, "কোথায়, দেখাইয়া দাও-না।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।"

নিতাই এই নূতন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারি মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, "চলো।"

যজ্ঞনাথ বলিলেন, “এখনো রাত্রি হয় নাই।”

নিতাই আবার কহিল, “রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।”

যজ্ঞনাথ কহিলেন, “এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।”

নিতাই মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, “এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।”

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রা-সংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুইপ্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, “এইখানে?”

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটি যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয় কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিম্নে একটা ঘরের মতো, এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নিচে গিয়া দেখিল, চারিদিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "সমস্তই? ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?"

"যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার পৌত্র কিংবা তাহার প্রপৌত্র কিংবা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিংবা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।"

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, "আচ্ছা।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "তবে এই আসনে বইস।"

"কেন।"

"তোমার পূজা হইবে।"

"কেন।"

"এইরূপ নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল, "দাদা।"

যজ্ঞনাথ কোন উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটা ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন, "যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড, তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড, তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড, তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড, তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড, তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।"

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাস-বায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল, যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, "দাদা, কোথায় যাও।"

যজ্ঞনাথ কহিলেন, "আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্— তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহু কষ্টে কহিল, "দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন, নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা।"

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তর-খণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইঁট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে

হইল, যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ঐ কে ডাকে "বাবা"।

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, "চুপ কর্। সবাই শুনিতে পাইবে।"

আবার কে ডাকে "বাবা"।

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল, "বাবা"। যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহাকে দাও।"

বৃদ্ধ চোখমুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "তোর ছেলে?"

বৃন্দাবন কহিল, "হাঁ, গোকুল— এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি, নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে

যেন বাতাস আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেলেন। কহিলেন, "কান্না শুনিতে পাইতেছ?"

বৃন্দাবন কহিল, "না।"

"কান পাতিয়া শোনো দেখি, 'বাবা' বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?"

বৃন্দাবন কহিল, "না।" বৃদ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কান্না শুনিতে পাইতেছ?" পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর-চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারিদিক হাতড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল, "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে?"

সেই বায়ুহীন অলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধুপ্‌ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

খাদ্য চাই

বিশ্বহিতৈষী নেভিন্‌সন সাহেব জার্মানির বর্তমান দুর্দিন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে সেখানকার অধিবাসীরা শরীর মনের সম্পূর্ণ তেজ রক্ষা করিবার উপযুক্ত আহার হইতে কিছুকাল ধরিয়া বঞ্চিত আছে। এই কারণে বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়াতে সমস্ত জাতির ভাবী উন্নতির পক্ষে যে বিষম ক্ষতির কারণ ঘটিতেছে তাহাই সবচেয়ে উদ্‌বেগের কথা। শিশুমৃত্যু-সংখ্যাও সেখানে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানকার একজন ডাক্তার বলিয়াছেন, দেশে যে-পরিমাণ খাদ্য আছে, তাহা মানুষকে একেবারে প্রাণে মারিবার পক্ষে কিছু বেশি অথচ বাঁচাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আলু, রুটি, মাংস ও মাখন উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। সামরিক শাসনে বাহির হইতে জার্মানিতে আহার প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দেশের এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

এই বর্ণনা পড়িয়া একটা কথা আমরা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। সেটা এই যে, কোনো একটা জাতিকে জ্ঞানে ও কর্মে পুরাদমে উন্নতির পথে চালাইতে হইলে প্রথম হইতেই তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার জোগাইতে হয়। শুধু কেবল বুদ্ধি থাকিলেই চলে না; উৎসাহ-অধ্যবসায়ের জোরে সেই বুদ্ধি ষোলো আনা পরিমাণে খাটাইতে হয়। দুইটা দেশের মানুষের

সংখ্যার তুলনা করিতে গেলে শুধু মাথাগুনতি করিয়া সত্য পরিমাণ পাওয়া যায় না। কোন্ দেশে মানুষ খাইতে পায় কত, সেটাকেও সংখ্যার সহিত যোগ করিলে তবে ঠিক ওজন পাওয়া যায়। জার্মানি যে-আদর্শের সভ্যতাকে এতদিন বহন করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে পোষণ করিতে যে-পরিমাণ খাদ্য লাগে সেই খাদ্য কমিয়া আসিলে তাহার মননশক্তি, তাহার কৃতিত্ব, সুতরাং তাহার ন্যাশনাল্ সফলতা কমিয়া আসিবে। কেন-না, বড়ো সভ্যতাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভূত পরিমাণে দরকার হয়, এজন্য যথেষ্ট আহার্য চাই।

এই উপলক্ষে নিজেদের দেশের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরিয়া আধপেটা খাইয়া আসিতেছে, সে কথা সকলেই জানে। জার্মানির ডাক্তার যাহা বলিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা পুরা খাটে। আমরা যতটা খাই তাহাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেন-না, শুধু কেবল নিশ্বাস লওয়াকেই তো বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি। কিন্তু যে-শিশু মরে না সে-যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বাঁচিয়া থাকিবার মতো আহার পায় না, সেইটাই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হইতে যদি ইহার ফল দেখি, তাহা হইলে দেখা যাইবে সর্বসমেত আমাদের দেশে কর্মশক্তি কম হওয়াতে অধিক মূল্য দিয়া অল্প

ফল পাই। অন্যদেশে একজনে যে কাজ করে, আমাদের দেশে সে কাজে অন্তত চারজনের দরকার হয়। ইহাতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তাহা নহে, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেন-না, কাজের শক্তি থাকিলে সেই শক্তি খাটাইতে আনন্দ হয়, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্ম সম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ। য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক কাজে ফাঁকি দেয়, তাহাদিগকে কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখিতে হয়। বংশানুক্রমে তাঁহাদের নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলিয়া একথা তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, এ দেশে কর্তব্য এড়াইবার জন্য ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীর-পোষণের অভাব হইতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে এবং জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহারও কারণ ঐ, শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলিবে না। কী করিয়া আমরা বাঁচিব একথা ভাবিবার নহে, কেন-না কোনো মতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। কী করিয়া আমরা পুরাপুরি বাঁচিব সেইটাই ভাবিবার কথা। কৃশতাবশত জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নাই বলিয়া জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করিয়া ফাঁকি দিতেছি, এ সম্বন্ধে আমরা সত্যপর হইতেছি না। ইহাতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হইতেছে, সবসুদ্ধ জড়াইয়া যে কম কাজ হইতেছে, কম ফসল ফলিতেছে, কম বিঘ্ন কাটিতেছে, প্রাণের স্রোত কম

করিয়া বহিতেছে, নিজেদের উপর আস্থা কম পড়িতেছে, অঙ্ক দিয়া কি তাহার পরিমাণ পাওয়া যায়। শরীরমনের উপবাসজাত যে অবসাদ ভীরুতা ঔদাসীন্য জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভার কি সামান্য।

এইসব বিপত্তি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থ কী করিয়া বাড়াইতে পারা যায় সে কথা ভাবিবার শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা ভাবুন, কিন্তু যতটুকু আহার্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে তাহার পুষ্টিকরতার বিচার করিয়া আহার সম্বন্ধে অবিলম্বে আমাদের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে যদি পারি তাহা হইলে এক দমে অনেকটা ফল পাওয়া যাইবে।

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

অবদানশতক

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন

"প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি"—
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে-অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তিপুরীর গগন-লগন-
প্রাসাদে॥

বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান
এখনো ধরেনি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।
ভিক্ষু কহে ডাকি, "হে নিদ্রিত পুর,
দেহো ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর"—
সুপ্ত পৌরজন শুনি সেই স্বর
শিহরে॥

সাধু কহে, "শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্ম মাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে!"
কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহা-সংগীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে॥

রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন,
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।
যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর,
মনে হল, তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা॥

বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুমভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহলভরে
নেহারি।

"জাগো, ভিক্ষা দাও" সবে ডাকি ডাকি
সুপ্ত সৌধে তুলি নিদ্রাহীন আঁখি
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারী ॥

ফেলি দিল পথে বণিকধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতনকণিকা—
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।
ধনী স্বর্ণ আনে থালি পুরে পুরে,
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে,
ভিক্ষু কহে, "ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো।"

বসনে ভূষণে ঢাকি গেল ধূলি
কনকে রতনে খেলিল বিজুলি,
সন্ন্যাসী ফুকারে লয়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে,—
"ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান,
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।"

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।
রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হল শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে॥

দীন নারী এক ভূতলশয়ন,
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।
অরণ্য-আড়ালে রহি কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে॥

ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ,
কহে, "ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"

চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে

প্রতিনিধি

আক্‌ওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠী গাথার যে ইংরেজী অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা "ভাগোয়া জেন্দা" নামে খ্যাত।

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা একদিন—
রামদাস, গুরু তাঁর, ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা— একি এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড,
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ?

এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।—)
কহিলা, "দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষাঝুলি ভরে একেবারে।"
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি,
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে,
"গুরু যবে ভিক্ষা-আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।"

গুরু চলেছেন গেয়ে— সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ, কত অশ্বরথ—
"হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্বচরাচর—
মোরে তুমি, হে ভিখারি, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।"

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন—
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল একধারে
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী॥

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ,
কহিলেন, "পুত্র, কহ শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে,
কোন্ গুণ আছে তব, গুণী।"

"তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান"—
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, "এই ঝুলি লহ তবে স্কন্ধে তুলি,
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।"

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলেমেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত, তাঁর ভিখারির ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরথরে—
ভাবে, ইহা মহতের লীলা॥

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্মকাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি,
"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছু তো অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি।"

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি—
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, "নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক;
প্রস্তুত রয়েছে দাস— আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।"

গুরু কহে, "তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার।
এই আমি দিনু কয়ে, মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন॥

বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস,
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো"—
কহিলেন গুরু রামদাস।

নৃপশিশু নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে ॥

পুরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,—
"আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস।
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে ;
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।"

তপস্যা

সূর্য চলেন ধীরে সন্ন্যাসীবেশে
পশ্চিমনদীতীরে সন্ধ্যার দেশে,
বনপথে প্রান্তরে লুণ্ঠিত করি'
গৈরিক গোধূলির ম্লান উত্তরী।
পিঠে লুটে পিঙ্গল মেঘজটাজুট,
শূন্যে চূর্ণ হল স্বর্ণমুকুট।
অন্তিম আলো তাঁর ঐ তো হারায়
রক্তিম গগনের শেষ কিনারায়—
সুদূর বনান্তের অঞ্জলি-'পরে
দক্ষিণা দিয়ে যান দক্ষিণ করে।
ক্লান্ত পক্ষিদল গান নাহি গায়,
নীড়ে-ফেরা কাক শুধু ডাক দিয়ে যায়;
রজনীগন্ধা শুধু রচে উপহার
যাত্রার পথে আনি অর্ঘ্য তাহার।
অন্ধকারের গুহা সংগীতহীন,
হে তাপস, লীলা তব সেথা হল লীন;
নিঃস্ব তিমিরঘন এই সন্ধ্যায়,
জানি না, বসিবে তুমি কী তপস্যায়।
রাত্রি হইবে শেষ, উষা আসি ধীরে
দ্বার খুলি দিবে তব ধ্যানমন্দিরে।

জাগিবে শক্তি তব নব উৎসবে,
রিক্ত করিল যাহা পূর্ণ তা হবে।
ডুবায়ে তিমিরতলে পুরাতন দিন
হে রবি, করিবে তারে নিত্য নবীন ॥

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কাননসভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে॥

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর না র'বে তোমার,
ভরিয়া উঠিবে শস্যের ভার,
গ্রাম-পথে-পথে গন্ধ তাহার
প্রসারিত হবে পবনে।

জননী, তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে ॥

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরনী ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী ;
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী ।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধশীতল ধরণী ॥

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে ।
দিকে দিকে, মাতা, কত আয়োজন ;
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে ।

ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে ॥

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য,
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী ॥

দেবতার বিদায়

দেবতামন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল "চলিলাম"— চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

বিসর্জন

দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর-পর
বয়স না হতে হতে পুরা দু'বছর।
এবার ছেলেটি তার জন্মিল যখন—
স্বামীরেও হারাল মল্লিকা। বন্ধুজন
বুঝাইল— পূর্ব জন্মে ছিল বহু পাপ,
এ জনমে তাই হেন দারুণ সন্তাপ।
শোকানলদগ্ধ নারী একান্ত বিনয়ে
অজ্ঞাত জন্মের পাপ শিরে বহি লয়ে
প্রায়শ্চিত্তে দিল মন। মন্দিরে মন্দিরে
যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়া ফিরে,
ব্রতধ্যান উপবাসে আহ্নিকে তর্পণে
কাটে দিন, ধূপে দীপে নৈবেদ্যে চন্দনে
পূজাগৃহে ; কেশে বাঁধি রাখিল মাদুলি
কুড়াইয়া শত ব্রাহ্মণের পদধূলি ;
শুনে রামায়ণ-কথা ; সন্ন্যাসী সাধুরে
ঘরে আনি আশীর্বাদ করায় শিশুরে।
বিশ্বমাঝে আপনারে রাখি সর্বনিচে
সবার প্রসন্ন দৃষ্টি অভাগী মাগিছে
আপন সন্তান-লাগি। সূর্য চন্দ্র হতে
পশু পক্ষী পতঙ্গ অবধি কোনোমতে

কেহ পাছে কোনো অপরাধ লয় মনে,
পাছে কেহ করে ক্ষোভ, অজানা কারণে
পাছে কারো লাগে ব্যথা, সকলের কাছে
আকুল বেদনাভরে দীন হয়ে আছে ॥

যখন বছর দেড় বয়স শিশুর
যকৃতের ঘটিল বিকার ; জ্বরাতুর
দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে। দেবালয়ে
মানিল মানত মাতা, পদামৃত লয়ে
করাইল পান, হরিসংকীর্তন গানে
কাঁপিল প্রাঙ্গণ। ব্যাধি শান্তি নাহি মানে।
কাঁদিয়া শুধাল নারী, "ব্রাহ্মণঠাকুর,
এত দুঃখে তবু পাপ নাহি হল দূর ?
দিনরাত্রি দেবতার মেনেছি দোহাই,
দিয়েছি এত যে পূজা তবু রক্ষা নাই ?
তবু কি নেবেন তাঁরা আমার বাছারে।
এত ক্ষুধা দেবতার ? এত ভারে ভারে
নৈবেদ্য দিলাম খেতে বেচিয়া গহনা,
সর্বস্ব খাওয়ানু তবু ক্ষুধা মিটিল না ?"
ব্রাহ্মণ কহিলা, "বাছা, এ যে ঘোর কলি—
অনেক করেছ বটে তবু এও বলি,

আজকাল তেমন কি ভক্তি আছে কারো ?
সত্যযুগে যা পারিত তা কি আজ পার’।
দানবীর কর্ণ-কাছে ধর্ম যবে এসে
পুত্রেরে চাহিল খেতে ব্রাহ্মণের বেশে,
নিজহস্তে সন্তানে কাটিল ; তখনি সে
শিশুরে ফিরিয়া পেল চক্ষের নিমিষে।
শিবিরাজা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের মুখেতে
আপন বুকের মাংস কাটি দিল খেতে—
পাইল অক্ষয় দেহ। নিষ্ঠা এরে বলে।
তেমন কি এ কালেতে আছে ভূমণ্ডলে।
মনে আছে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি
মার কাছে— তাঁদের গ্রামের কাছাকাছি
ছিল এক বন্ধ্যা নারী, না পাইয়া পথ
প্রথম গর্ভের ছেলে করিল মানত
মা-গঙ্গার কাছে ; শেষে পুত্রজন্ম-পরে
অভাগী বিধবা হল, গেল সে সাগরে,
কহিল সে নিষ্ঠাভরে মা-গঙ্গারে ডেকে
‘মা, তোমারি কোলে আমি দিলাম ছেলেকে—
এ মোর প্রথম পুত্র, শেষ পুত্র এই,
এ জন্মের তরে আর পুত্র-আশা নেই।’
যেমনি জলেতে ফেলা, মাতা ভাগীরথী
মকরবাহিনী-রূপে হয়ে মূর্তিমতী

শিশু লয়ে আপনার পদ্মকরতলে
মার কোলে সমর্পিল। নিষ্ঠা এরে বলে।”
মল্লিকা ফিরিয়া এল নতশির করে;
আপনারে ধিক্কারিল, “এতদিন ধ’রে
বৃথা ব্রত করিলাম, বৃথা দেবার্চনা—
নিষ্ঠাহীনা পাপিষ্ঠারে ফল মিলিল না।”

ঘরে ফিরে এসে দেখে শিশু অচেতন
জ্বরাবেশে। অঙ্গ যেন অগ্নির মতন;
ঔষধ গিলাতে যায় যত বার বার
পড়ে যায়, কণ্ঠ দিয়া নামিল না আর;
দন্তে দন্তে গেল আঁটি। বৈদ্য শির নাড়ি
ধীরে ধীরে চলি গেল রোগীগৃহ ছাড়ি।
সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে,
একা শোকাতুরা নারী। শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারিধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর,—
“ও মানিক, ওরে সোনা, এই যে মা তোর,
এই যে মায়ের কোল, ভয় কী রে বাপ।”
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ

চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার
প্রাণপণে। সহসা বাতাসে গৃহদ্বার
খুলে গেল; ক্ষীণ দীপ নিবিল তখনি;
সহসা বাহির হতে কলকলধ্বনি
পশিল গৃহের মাঝে। চমকিয়া নারী
দাঁড়ায়ে উঠিল বেগে শয্যাতল ছাড়ি;
কহিল, "মায়ের ডাক ওই শুনা যায়—
ও মোর দুঃখীর ধন, পেয়েছি উপায়—
তোর মার কোল-চেয়ে সুশীতল কোল
আছে, ওরে বাছা।"— জাগিয়াছে কলরোল
অদূরে জাহ্নবীজলে; এসেছে জোয়ার
পূর্ণিমায়। শিশুর তাপিত দেহভার
বক্ষে লয়ে মাতা গেল শূন্য ঘাট-পানে।
কহিল, "মা, মার ব্যথা যদি বাজে প্রাণে
তবে এ শিশুর তাপ দে গো মা, জুড়ায়ে।
একমাত্র ধন মোর দিনু তোর পায়ে
একমনে।" এত বলি সমর্পিল জলে
অচেতন শিশুটিরে লয়ে করতলে
চক্ষু মুদি। বহুক্ষণ আঁখি মেলিল না;
ধ্যানে নিরখিল বসি, মকরবাহনা
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি ক্ষুদ্র শিশুটিরে
কোলে করে এসেছেন, রাখি' তার শিরে

একটি পদ্মের দল ; হাসিমুখে ছেলে
অনিন্দিত কান্তি ধরি দেবীকোল ফেলে
মার কোলে আসিবারে বাড়ায়েছে কর।
কহে দেবী, "রে দুঃখিনী, এই তুই ধর্
তোর ধন তোরে দিনু।"— রোমাঞ্চিতকায়
নয়ন মেলিয়া কহে, "কই মা,— কোথায়।"
পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে বিহ্বলা রজনী ;
গঙ্গা বহি চলি যায় করি কলধ্বনি।
চীৎকারি উঠিল নারী, "দিবিনে ফিরায়ে ?"
মর্মরিল বনভূমি দক্ষিণের বায়ে॥

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি,— তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালোছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি॥

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি ;
ছিল কুকুর ; ছিল বেড়াল ; নানা রঙের ঘোড়া
কিছু না-হয় ছিল ছ-সাতজোড়া ;
দেউড়িভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাসি।
—আর ছিল এক মাসি॥

স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একমাত্র চেষ্টা-যে তার কী করে আপ্‌নারে
মুছবে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউবা ব'লে ওঠে "আপদ জুটল কোথা থেকে",

আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম-
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম ॥

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে ;
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা ;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।
শিশুচিত্ত-উৎসধারা বন্ধ ক'রে দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে, "চুপ্ চুপ্— "
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা ;
খুশি হলে রাখবে চাপি,
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি।
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী ;
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হ'ত পদে পদেই দোষী।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড় ;
এরা যদি উলটে দিত চড়
থাকত নাকো গণ্ডগোলের সীমা—
উভয় পক্ষেরই মা

কানাই বলাই দোঁহার 'পরে পড়ত ঝড়ের মতো,
বিষম কাণ্ড হ'ত
ডাইনে বাঁয়ে দুধার থেকে মারের 'পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাকত উপবাসী—
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি॥

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলাফেরা ওঠাবসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখিহারা পক্ষীনীড়ের প্রায়
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি;
ঘুচে গেল ন্যায়বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।
সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্বাক।
চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয়, তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত "ক্ষুধা নাই"।

অসুখ করলে দিত চাপা ; দেব্‌তা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেলে এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্য হাতে বাড়ি।
প্রমাদ গনি দীর্ঘনিশাস ছাড়ি
মা ডেকে কয় কানাই-বলাইয়েরে,
"ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
তোদের প্রাইজ ছুটি।
তারপরে যা ছুটি
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি, কেউ যেন না শোনে।"
এই ব'লে মা নিয়ে ঘরের কোণে
ছুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে॥

এম্‌নি ক'রে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন ক'রে ছুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।
সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান—

আগুন তারি শিখার সমান
জ্বলছে এদের প্রাণ-প্রদীপের মুখে।
সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্য-পানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে॥

কানাই বলাই

কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই।
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
করল চুরি পান্না-মোতির হার,—
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার।
পুলিস ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে—
যখন ধরা পড়ে-পড়ে
অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাই দাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বললে এসে,
"তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা।

ছেলেমানুষ, দোষ কী ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।”
কানাই বলাই জ্ব’লে ওঠে প্রলয়বহ্নি-প্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বললেন, “আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।”
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি ;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী—
ঘোড়ার সহিস, বেহারা, চাপরাসি ॥

অপমানের তীব্র আলোক জ্বেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চ’লে চ’লে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি-দুটি আসছে নাতনি-নাতি,—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথি।
মা বললেন, “মিটবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।”
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পুজোর ছুটির দিনে
মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে ॥

বছর খানেক না পেরোতেই শ্রাবণ মাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক সবাই; মা বললেন, "তোরা আমার ছেলে,
তোদের এমন বুদ্ধি হল অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে!"
কানাই বললে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্ব'লেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে—
সে কথাটি এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"
মা বললেন, "ভুলবি কেন। মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তা হলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো 'পরে
বাইরে কিম্বা ঘরে।
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল, যদি আমি স্বপ্নমাত্র হই—
জেগে দেখি, আমি যদি কোথাও কিছুই নই—
তা হলে হয় ভালো।
মনে হল, শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা—
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।

তাই তো বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনোজনা,
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
ব'লে রাখি সে-কথা এইখানে।
বারো বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাই দাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ ক'রে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল ভাঙার জাল হিসাবের দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, "মনে কি নেই।" অপূর্ব কয় নতমুখে,
"অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।"
"চুকে গেছে?" কানাই উঠল বিষম রাগে জ্ব'লে,
"এত দিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে ব'লে।"
নিচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারি ঘরে।
বললে, "আমায় রক্ষা করো।"
বলাই কেঁপে উঠল থরোথরো।

অধিক কথা কয় না সে-যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে।
অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে ॥

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী-যে ;
এদের ঘরে নিজে
আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম ক'রে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী ;
পূর্ণ বললে, "রক্ষা করো, মাসি।"

এরি পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে,
"জানো তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য—
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে—
উচিত নয় মা, সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
বললে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে,
দেখব তখন বিবেচনা করে।"
মা বললেন, "তোরা বলিস কী এ।
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে

আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম।

এই কি তোদের ধর্ম।”

এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি ;

তারা বলে, “যাচ্ছ কোথায়।” মা বললেন, “অপূর্বদের বাড়ি।

দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,

রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে।”

“রোসো, রোসো, থামো, থামো, করছ এ কী।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

তোমার ইচ্ছা যবে

আচ্ছা না হয়, যা বলছ তাই হবে।”

আর কি থামেন তিনি।

গেলেন একাকিনী

অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি।

ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাসি।

প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী॥

পদ্মা

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
অবসান-সন্ধ্যালোকে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়েছিল তোমা-পানে হাসিভরা মুখে।
সেদিনের পর হতে হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার॥

নানাকর্মে মোর কাছে আসে নানাজন,
নাহি জানে আমাদের পরান-বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকাশয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল,

যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটিরে কুটিরে,
তুমি কোন্ গান ক'র আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায়নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
কতবার দেখাশুনা তোমায় আমায়॥

(কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খর স্রোতে—)
কত গ্রাম, কত মাঠ, কত ঝাউঝাড়,
কত বালুচর, কত ভেঙেপড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে—
আরবার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়॥

বিচারক

পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত। অ্যাকওয়ার্থ সাহেব প্রণীত Ballads of the Marathas নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠী গাথার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও
  পেশোয়া নৃপতিবংশ—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর,
"হরণ করিব ভার পৃথিবীর,
মৈসুরপতি হৈদরালির
  দর্প করিব ধ্বংস।"

দেখিতে দেখিতে পুরিয়া উঠিল
  সেনানী আশীসহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরী হতে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে
  ছুটিয়া আসে অজস্র॥

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা,
  ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।

হুলুরব করে অঙ্গনা-সবে,
মারাঠা-নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে
বাজে ভৈরবডঙ্ক ॥

ধুলার আড়ালে ধ্বজ-অরণ্যে
লুকালো প্রভাতসূর্য।
রক্ত অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়কোলাহলে,
সহসা যেন কী মন্ত্রের বলে
থেমে গেল রণতূর্য ॥

সহসা কাহার চরণে ভূপতি
জানালো পরম দৈন্য।
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে
আশীসহস্র সৈন্য ॥

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়ালো সমুখে
ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও

কহিলেন ডাকি, "রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও,
না লয়ে পাপের শাস্তি।"

নীরব হইল জয়কোলাহল,
নীরব সমরবাদ্য।
"প্রভু কেন আজি"—কহে রঘুনাথ,
"অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ?
চলেছি করিতে শত্রুনিপাত
জোগাতে যমের খাদ্য।"

কহিলা শাস্ত্রী, "বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধানসূত্রে।"

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও,
কাহলা করিয়া হাস্য,
"নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,

শুনিতে আসিনি পথ-মাঝখানে
ন্যায়বিধানের ভাষ্য।"

কহিলা শাস্ত্রী, "রঘুনাথ রাও,
যাও, করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।"

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক,
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেল গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র॥

বিশ্বদেব

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিস-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবি তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ-'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে॥

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—

অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আভরণে
হিরণ-কিরণে-গাঁথা—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে॥

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গল শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুংকার
ভেদি বণিকের ধনঝংকার

মহাকাশ তলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সংগীততানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব মহাবাণী।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল-পানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গল বিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে॥

দীনদান

নিবেদিল রাজভৃত্য, "মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নাম-সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেই মতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি,
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
"হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন

দেবতার স্তবগান গাহিতেছে পথপ্রান্তে বসে।”
“সে মন্দিরে দেব নাই” কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
“দেব নাই? হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ!
রত্নসিংহাসন-’পরে দীপিতেছে রতন-বিগ্রহ—
শূন্য তাহা?”

“শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ,” সাধু কহে,
“আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।”
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, “বিংশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে-মন্দির অম্বর ভেদিয়া
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে-মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান?”
শান্ত মুখে কহে সাধু, “যে-বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়—
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে-বৎসর
বিংশলক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সেদিন কহিলা ভগবান,
‘আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য শান্তি দয়া প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ

নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে,
সে আমারে গৃহ করে দান ?' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়,
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ।"

রাজা জ্বলি রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্ত্তে চলি যাও।"

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
"ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর' ভক্তজনে।"

ভোরের পাখি

ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে।
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে।
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালিবরন পুচ্ছডোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে
পাখি কোথায় ডাকে॥

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি,
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেলো তোমার আঁখি।
কোমল তোমার পাখার ’পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
বাঁধা আছে ডানায় তোমার
উষার রাঙা রাখি।

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি ॥

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুলছে মাটি ব্যেপে,
পাতার উপর পাতার ঘটা
উঠছে ফুলে কেঁপে।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাখাতে ঘুম ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে ॥

ওগো ভোরের সরল পাখি,
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমার কুলায়-'পরে
কেমন ক'রে প্রবেশ করে
আকাশ হতে আঁধার পথে
আলোর বার্তাবহ ?

ওগো ভোরের সরল পাখি,
কহ আমায় কহ ॥

কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে,
উড়বে ব'লে পুলক জাগে
তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে ॥

এত আঁধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাকো, "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"

এত আঁধার-মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।

আনন্দেতে জাগো আজি,
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখি ডাকে যে ঐ
তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়,
নিদ্রাভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ময়ী উদয়দেবীর
আশীর্বচন মাগো।
ভোরের পাখি গাহিছে ঐ,
আনন্দেতে জাগো।